‘এই আকাশের নীচে’ : প্রসঙ্গ একুশ শতকের সমাজজীবনের অবক্ষয়ী রূপ

ড. সুপেন্দ্র নাথ রায়
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজ, শ্রীভূমি, আসাম, ভারত
Gmail- supendra.khalaigram@gmail.com/9531633667

সারসংক্ষেপ :
বর্তমানে আমরা এক ঘোর অবক্ষয়ী সমাজে বসবাস করছি। যেখানে শুধুমাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া বাকি সমস্তকিছুই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা বিসর্জন দিয়েছি আমাদের মানবিকতাকে, মনুষ্যত্বকে, মূল্যবোধকে। স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতা-সহানুভূতি এসবের এখন আর কোনও মূল্য নেই। এই আত্মকেন্দ্রিকতা কখনো কখনো এমন ভয়ংকর রূপ নেয় যে, মা-বাবা-ভাই-বোনকে পর্যন্ত পদাঘাত করতে দ্বিধা করি না। বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর লেখায় একুশ শতকের এই অবক্ষয়ী সমাজকে তুলে ধরেছেন। তাঁর **‘এই আকাশের নীচে’ উপন্যাসে রয়েছে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভাইবোনদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র। এখানে কেউই ত্যাগ স্বীকার করে রাজি নয়। প্রত্যেকেই আপনাপন সিদ্ধান্তে অটল। এই উপন্যাসের নিবিড় পাঠে মাধ্যমে একুশ শতকের মানুষের চারিত্রিক অধঃপতন, নৈতিক অবক্ষয় আর ভণ্ডামিকে তুলে ধরাই হবে মূল প্রবন্ধের লক্ষ্যবস্তু।**

বীজ শব্দ : নৈতিক অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক অবক্ষয়।

মূল **প্রবন্ধ :**

নির্মাতা তথা স্রষ্টা তো সমাজেরই একজন। ফলত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নির্মাণে উঠে আসে মানুষ, তার জীবন ও জীবিকা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিসররের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সমকালীন মানবজীবনকে উপন্যাসে অভিব্যক্ত করেছেন। মানবজীবনকে সাহিত্যে তুলে আনার এই ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন বিশিষ্ট নারী ঔপন্যাসিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যও(১৯৫০-২০১৫)। পাঠকসমাজের এই জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। ১৯৫০ সালের ১০ জানুয়ারি বিহারের ভাগলপুরে তাঁর জন্ম। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা মহানগরে পদার্পণ করেন এবং এই শহরকে কেন্দ্র করেই তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন আবর্তিত হয়। সত্তরের দশকে সাহিত্যজগতে তাঁর প্রবেশ মূলত গল্প রচনার মাধ্যমে। উপন্যাস নির্মাণ করেন একটু বিলম্বে। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘যখন যুদ্ধ’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। এক ক্ষয়িষ্ণু, ভঙ্গুর ও মূল্যবোধহীন মানব তথা সমাজজীবনের প্রেক্ষিতে সুচিত্রা ভট্টাচার্য উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি দেখেছেন ভোগবাদের আঘাতে মানুষের চরিত্রের স্খলনকে, মানুষের স্বার্থপর ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে, যৌথ পরিবারের পতনকে। দেখেছেন কর্মসংস্থানহীন এক সমাজকে। ‘এই আকাশের নীচে’ উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে এই প্রেক্ষিতভূমি থেকেই।

আমরা প্রত্যক্ষ করি সময় যত অতিক্রান্ত হচ্ছে মানুষের মধ্যে ততই দৃশ্যমান হচ্ছে এক ধরনের অস্থিরতা। মানবজীবনের স্বাভাবিক মূল্যবোধ – স্নেহ, মায়া, মমতা, দয়া, সহানুভূতি, ঐক্যবদ্ধ মানসিকতা ইত্যাদি ভেঙে এখন খানখান। পারস্পরিক সৌহার্দের দৃশ্য এখন বিরল। তার বদলে দৃশ্যমান হয় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিচ্ছবি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্নীতিবাজ, ভণ্ড, জোচ্চোর আর ঠকবাজ হতেও আজ আর পিছপা হচ্ছে না মানুষ। বরং বেঁচে থাকার জন্য এইসব নেতিবাচক গুণকে মানুষ তার জীবনের বিশেষ গুণ বলে স্বীকার করে নিচ্ছে। মানুষের কাছে এযুগ প্রতিযোগিতার যুগ এবং আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে প্রতিপক্ষ। তাই প্রতিপক্ষকে পদাঘাত করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নামই এখন জীবন। অর্থাৎ যেকোনো মূল্যে অর্থ আয় করাই হল একুশ শতকের জীবনের লক্ষ্য। আর এই অর্থবলই এযুগে মানুষকে এনে দিচ্ছে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা।

'এই আকাশের নীচে'(২০১৫) উপন্যাসের যাবতীয় ঘটনাবলী আকাশে ঘটেনি, আকাশের নীচেই ঘটেছে। কোনো অলীক কল্পনার জগৎ নয়, আমাদের মর্ত্য-পৃথিবীর চেনা-পরিচিত চলতি শতকের জীবনভাষ্যই ব্যক্ত হয়েছে এখানে। মাত্র দু'লাইনে উপন্যাসের কথকতাকে যদি লিখনবন্দি করা যায় তাহলে বলতে পারি- নাবিক সরোজ ঘোষাল স্ত্রী রুবি ঘোষাল আর পাঁচ পুত্রকন্যাকে নিয়ে স্বচ্ছলতা, সৌরভ দিয়ে নির্মাণ করে প্রাণের সংসার। এই সরোজ ঘোষালের মৃত্যুর পর পাঁচ পুত্রকন্যার জীবন যে বিচিত্র-বিশৃঙ্খল পথে ধাবিত হয় তার মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই একুশ শতকের মানব জীবনকে। পাঁচ পুত্রকন্যার জীবনযাপনে, স্বার্থপরতায়, কূটকৌশলে, চেহারায় ও চলনে-বলনে একুশ শতকের পুরো সমাজজীবনই উদ্ঘাতিত হয়েছে।

একুশ শতকের মানুষ ব্যক্তিস্বার্থমুখি। ব্যক্তিস্বার্থই প্রাধান্য পায় সর্বাগ্রে। ব্যক্তিস্বার্থ পূরণ করার জন্য যেকোনো অন্যায়, অপকর্ম করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নয় এই শতকের মানুষ। এজন্য সে অস্বীকার করে সমস্তরকমের মানবীয় সম্পর্ককে। প্রতিপক্ষ ষড়যন্ত্র করছে কিনা এনিয়ে সর্বক্ষণ এক ধরনের সন্দেহ আর ভয় কাজ করে মানুষের মধ্যে। সর্বদা সন্দেহপ্রবণ মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে একজন মানুষ অপর একজন মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্বার্থসিদ্ধির জন্যও অন্যকে পশ্চাদে ঠেলে ফেলে দেওয়ার দিতে নানা কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এযুগের মানুষ। কাউকে সাহায্য করার পশ্চাদেও নিহিত থাকে এযুগের মানুষের গোপন স্বার্থ। কখনো কখনো সৌজন্য, শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘিত হয় চূড়ান্তভাবে। বহুভাষামিশ্রিত বিচিত্র, অশ্লীল বাচনভঙ্গি এখন এযুগের মানুষের সম্বল।

উপন্যাসে ঘোষাল পরিবারকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ঘটনাবলী আবর্তিত হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে একুশ শতকের দর্পণ। নাবিক সরোজ ঘোষাল তার পাঁচ পুত্রকন্যার সুমার্জিত নামকরণ করেছিলেন। অরুণেশ, নীলিমেশ, ত্রিদিবেশ, প্রিয়ংবদা আর দেবাদৃতা। কিন্তু একুশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু মানবসমাজের সংস্পর্শে এসে পাঁচ ভাইবোন তাদের পিতৃ প্রদত্ত নামের সঙ্গে চারিত্রিক গুণাবলির মেলবন্ধন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। একুশ শতকের কার্যকলাপ, কথাবার্তা আর স্বভাবগুণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এলাকায় তাদের নতুন নাম হয় টাট্টু, ফক্কা, ডিব্বা, কলি আর ফুটি। নতুন কালের সংস্পর্শে এসে এভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে মানুষের রুচি। বলা ভালো এযুগে মানুষের মার্জিত রুচি আর পাত্তা পাচ্ছে না। এরা পরস্পর পরস্পরকে অনায়াসে পাঁঠি, শালা, শালি, মাগি, মাল, হারামজাদি বলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে পারে। রাতদুপুরে এরা যখন মারামারি করে তখন প্রতিবেশীরা হাততালি দিলেও এদের কিছুই যায় আসে না। বর্তমান শতকের এই ক্ষয়িষ্ণু মানবসম্পর্কের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন-

> 'তিন জনই খ্যাপা কুকুর হয়ে দাঁত নখ বের করে নেমে পড়েছে কামড়াকামড়িতে। অকথ্য গালিগালাজে বিষাক্ত হয়ে উঠছে বাতাস। টাট্টু গিয়ে ঘুষি চালাল ফক্কাকে, পাল্টা লাথি গিয়ে আছড়ে পড়ল ডিব্বার পেটে, ডিব্বার এলোপাথাড়ি হাত চালানোয় লুটিয়ে পড়ল টাট্টু, পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে মোষের মতো মাথা নামিয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়েছে। তিন মত্ত দানবের গর্জনে জেগে যাচ্ছিল পড়াপড়শি।'[১]

এই একান্নবর্তী পরিবারের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে কলি। বাজারঘাট করা থেকে শুরু করে সবাইকে রান্না করে খাওয়ানোর দায়িত্ব তার। একবার রান্নাঘরে ঢুকলে আজীবন সেই দায়িত্ব বহন করতে হবে – এই ভেবে বাড়ির দুই বউয়ের কেউই রান্নাঘরে প্রবেশ করে না। নিজের সুবিধা আর স্বার্থের কথা ভেবে কলির বিয়ের কথাও ভাবেনি কেউ। ভাই-বউদের সন্দেহ- কলির বিয়ে হলে পাছে বাড়ির বউকে রান্না করতে হয় ও একজন বিনা পয়সার দাসী হাতছাড়া হয়। অর্থাৎ একুশ শতকের মানুষ কতটা স্বার্থপর হলে একজন ভাই পর্যন্ত তার দিদি সম্পর্কে এরূপ ভাবনা পোষণ করতে পারে টাট্টু, ফক্কা আর ডিব্বারা তার প্রমাণ। আবার বাড়ি যখন প্রোমোটারের হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং অন্যদের মতো কলিও নগদ অর্থের সঙ্গে একটি ফ্ল্যাটের ভাগীদার হয় তখন কলির সেই নগদ অর্থ ও ফ্ল্যাট হাতিয়ে নেওয়ার জন্য পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম আর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় অন্য ভাইবোনেরা। তিন দাদা সম্পর্কে ছোট বোন ফুটি তাই ভাবে-

> 'বড় মেজ ছোট, তিনজনেরই যা কুমিরের হাঁ। টাকা পৌঁছানোর আগেই হয়তো কলিরানির ভাগের মাল ঝাপ্পুস হয়ে যাবে। মাঝে তিন তিনটে দিন চলে গেল, হয়তো জপিয়েই ফেলেছে বড়কর্তা। ছোটও অবিশ্যি কম সেয়ানা নয়, সেও কি এই কদিনে একবার ট্রাই নেয়নি? পটানোর কাজে মেজদাও কম ওস্তাদ নয়। বরং তাকে ধড়িবাজ নাম্বার ওয়ানই বলা যায়। তিন মূর্তির একজনও যদি পুরোপুরি বগলে ভরে ফেলে, আর কি কলিকে কবজা করতে পারবে ফুটি?'[২]

কলিকে কব্জা করতে তারা বিভিন্নভাবে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। দরদী হয়ে ওঠে কলির প্রতি- বাড়ির বড়ো বউ পিংকি তাকে রান্নার কাজে সাহায্য করে, ডিব্বা কলির জন্য নিয়ে আসে কচুরি। কলির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয় ফুটিও। সে বলে- 'আমি যে তোর একমাত্র বোন, আমি কি তোর কথা না ভেবে পারি? তোর চিন্তায় চিন্তায় আমার তো ঘুম উবে যাওয়ার জোগাড়।'[৩]

যেখান থেকে পারা যায় খাবলেখুবলে ও খামচেখুমচে অর্থ রোজগার করাই এ শতকের মানুষের লক্ষ্য। উপন্যাসের অধিকাংশ কুশীলব তাই লোকলজ্জাহীন। আপনজনের ভালোবাসার চেয়ে এদের কাছে কেবলমাত্র প্রাধান্য পায় অর্থ। রুবি ঘোষালের মৃত্যুর পর তার হার কে বাগিয়ে নেবে তা নিয়ে নিঃসংকোচে তারা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। শোক-সন্তাপ আর দয়া-মায়ারও কোনো মূল্য নেই এই শতকে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকে তাই অর্থ আয় করার চেষ্টা করে মানুষ। মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ডিব্বা যে ক্যাটারার নিয়োগ করেছে সেখান থেকে সে প্রতি প্লেটে আট টাকা কমিশন নেওয়ার ব্যবস্থা করে। এই কমিশন আদায় প্রতিযোগিতায় জিততে না পেরে ডিব্বার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ফক্কা। ভাইকে 'শালা' বলে গালিগালাজ করে ক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করে।

অর্থাৎ জীবিকার ক্ষেত্রে যেকোনো অসদ পন্থা অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না একুশ শতকের মানুষ। জমিবাড়ি দেখানোর নাম করে মানুষকে ফাঁসিয়ে অর্থ আয় করে বাড়ির বড়ো সন্তান টাটু। বিমার এজেন্ট সেজে মানুষকে বোকা বানিয়েও সে অর্থ রোজগার করে। এজন্য তাকে মানুষের গালিও হজম করতে হয়েছে। ডিব্বাও জাল পাথরের ব্যবসা করে। পরে সে ভেকধারী জ্যোতিষী হয়ে মানুষের ভাগ্যগণনা করে। ধাপ্পাবাজি করে মানুষকে ঠকিয়ে অর্থ রোজগার করে ফক্কাও। অন্যের গাড়িকে নিজের গাড়ি বলে পরিচয় দিয়ে বিক্রি করে ক্রেতার কাছ থেকে সে দশ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। শিক্ষিত বেকার যুবকযুবতিদের চাকরি দেওয়ার নাম করে ভুয়ো ইন্টার্ভিউয়ের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায় করার পরিকল্পনাও সে করে। এত বড়ো অন্যায় অপকর্ম করতে সে বিন্দুমাত্র শঙ্কিত নয়, বরং সে উচ্ছ্বসিত। এবং একাজে সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে তৎপর। বুক ফুলিয়ে সে বলে-

> 'আরে বাবা, ফক্কাকে যে গারদে পুরবে, সে এখনও মায়ের গর্ভে। তবে হ্যাঁ, এখন ফক্কা যে লাইনটা ধরেছে তাতে বিস্তর খাটুনি। চাকরি পাইয়ে দেওয়াটা কি সোজা কাজ? তাই যদি হত, নিজে কি সে বেকার থাকত এখনও? এই ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত? তারপরেও যদি লোকে আশায় আশায় তাকে টাকা দেয়, আসমান থেকে রেলের পাকা চাকরি টুপুস খসে পড়বে বলে বিশ্বাস করে, সেই আহাম্মকির দায় কেন নেবে ফক্কা?'[৪]

একুশ শতকের সমাজজীবনে প্রেমভালোবাসার মতো পবিত্র, মধুর সম্পর্কে প্রবেশ করে পঙ্কিলতাও। খাটি প্রেমভালোবাসার চিত্র এ সমাজে এখন খুঁজে পাওয়া ভার। প্রেম এখন হয়ে উঠেছে পুরোপুরি স্বার্থকেন্দ্রিক। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য এখানে প্রেম-প্রমিকা উভয়ই প্রেমের অভিনয় করে চলে। তাই স্বার্থ পূরণ না হলে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে সেই ভালোবাসা। উপন্যাসে একারণেই কলিকে ছেড়ে পালিয়ে যায় ললিত। নিবিড় অধ্যয়নে দেখি কলিকে কখনোই ভালোবাসেনি ললিত। সে ভালোবেসেছিল কলির বিশাল বংশকে, ধনসম্পত্তিকে। তাই তার কণ্ঠ দিয়ে উচ্চারিত হয় 'কত বড় বংশের মেয়ে তুমি, কী বিশাল তোমাদের বাড়িঘরদোর, এমন একটা রাজকন্যা আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে, এ কি যে সে কলাল?'[৫] ভালোবাসার অভিনয় করে কলিকে বিয়ে করে তার সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়াই ছিল ললিতের উদ্দেশ্য। তার এই গোপন, গভীর অভিসন্ধি যখন বাধাপ্রাপ্ত হয় তখনই প্রকাশ পায় তার প্রকৃত মুখ ও মুখোশ। ললিত কলিকে বলে-

> 'দ্যাখো, একটা কথা আমি তোমায় পস্টাপস্টি বলতে চাই। তোমাকে আমি পছন্দ করি ঠিকই, তবে ঘোষালবাড়ির প্রাপ্য অংশটাও তো আমার চাই।...আর শুধু থাকার জায়গা পেলে তো হবে না। আমার চাই সলিড ক্যাশ। তোমার ভরণপোষণ, প্লাস বাচ্চার খরচা...। তুমি নিশ্চয়ই এত সুন্দরী নও, যে তোমার মুখ দেখে দেখে আমার জীবন কেটে যাবে।'[৬]

ভালোবাসার পাশাপাশি এ সমাজে সরলতারও কোনো মূল্য নেই। মানুষের সরলতাকে এখন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়। সরল মানুষকে নিয়ে অবিরাম চলে হাসি-ঠাট্টা-মশকরা। সরল মানুষ জটিল আর কুটিল নয় জন্যই, তারা স্বার্থপর ও চতুর নয় জন্যই এবং তারা ফাঁকি দিতে অসমর্থ জন্যই সমাজে এদের গুরুত্ব নেই। স্ত্রী ফুটির কাছে তাই কোনো গুরুত্ব পায় না সঙ্গীত-শিক্ষক হেমন্ত। স্ত্রীর কাছ থেকে দিনরাত তাকে কটূ মন্তব্য শুনতে

হয়। স্ত্রীর কাছে সে জাতকুঁড়ে, অকর্মা। কারণ সে স্বার্থপর নয়। জটিল, কুটিলও নয়। সে ফাঁকি দিতেও পারে না। বরং কারও ক্ষতি হচ্ছে কিনা তা বিচার করার মতো উদার দৃষ্টিভঙ্গি তার রয়েছে। এই সরল স্বভাবের দরুণ স্ত্রীর স্বার্থ মাঝেমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হলে তাকে চূড়ান্তভাবে অসম্মানিত হতে হয়।

এই জটিল, কুটিল, পারস্পরিক রেষারেষি, প্রেমহীন ও নীতিবর্জিত সংসার-সমাজে একজন শিশুর পক্ষে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হয়ে ওঠা অসম্ভব। এই স্বার্থপর সংসার-সমাজে জন্মগ্রহণ করলে তার পক্ষেও নীতিহীন হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তাই উপন্যাসের শেষে মরা শিশু প্রসব করে কলি। যেখানে আদর্শবান হয়ে ওঠা এবং আদর্শবান হয়ে থাকা কঠিন সেখানে কী করে স্বাভাবিক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে? তাই মৃত সন্তান প্রসবে বিন্দুমাত্র ভেঙে পড়েনি কলি। বরং সে খুশিই হয়। সে বলে, 'ব্যাটা তো জোর বেঁচে গেল! দুনিয়ায় একবার এন্ট্রি নিলে ফেললে কোন চক্করে পড়ত তার ঠিক আছে?'[৭] অর্থাৎ আমাদের অনুধাবন করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, সমাজজীবনের কতটা অবক্ষয় ঘটলে একজন মা পর্যন্ত মৃত সন্তান প্রসবে হাহাকার না করে আনন্দিত হয় ওঠে। এ কি সমাজের গভীর ক্যান্সার নয়? গভীর ক্ষত নয়? এ জন্যই তো বাড়ির কর্তা সরোজ ঘোষাল লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। যেখানে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, স্বার্থপরতা বিরাজ করে; যেখানে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্তে সামিল হয় সেই সমাজের ক্যান্সার হওয়াই তো স্বাভাবিক। আমাদের চরিত্র, মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি আর চিন্তাভাবনার এই যে সংকীর্ণতা, পঙ্গুতা, দীনতা ও দুরবস্থা তা থেকে আমরা কিছুতেই মুক্তি লাভ করতে পারছি না। রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি করে তাই সরোজ ঘোষালকে বাঁচানো যায়নি। ভাইবোনদের ছলচাতুরী ও কূটকৌশলে মর্মাহত হলেও তবুও শেষপর্যন্ত ভাইদের সংসারেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কলি। চেষ্টা করে ছাদে বিভিন্ন রঙের ফুলগাছ রোপণ করতে। অর্থাৎ এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মানুষজনের কাছে ও পাশে থেকেই তাদের স্বভাব পরিবর্তন করার আশাবাদী ভাবনা ব্যঞ্জিত হয়েছে ফুলগাছ রোপণ করার মাধ্যমে। এখানেই দৃশ্যমান হয় ঔপন্যাসিক হিসেবে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের অনন্যতা। এভাবেই উদ্ঘাটিত হয় একুশ শতকের জীবনভাষ্য।

সূত্র নির্দেশ:

১) ভট্টাচার্য, সুচিত্রা: এই আকাশের নীচে, দেজ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- জুলাই ২০২২, পৃষ্ঠা- ১১২
২) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৭
৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৫
৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ১০০
৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫২
৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৯
৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪১